তামিল ভোটদাতাঃ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন না তারকামুগ্ধ?

রাধা কুমার

৮ জুলাই, ২০২৪

১৯৭৭ সালে তামিল চলচ্চিত্রের মহাতারকা এম. জি. রামচন্দ্রন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় অভিনেতা যিনি এই মর্যাদাপূর্ণ পদ অধিকার করেন। এই ঘটনার পরের কয়েক দশক ধরে এম.জি.আর. ও তামিল চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক আছে, এমন অনেক ব্যক্তিত্ব রাজ্যের বিভিন্ন উচ্চস্তরের নির্বাচিত পদ অলঙ্কৃত করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হল, এম. করুণানিধি, ও জে. জয়ললিতা। করুণানিধি একজন চিত্রনাট্যকার ছিলেন ও পাঁচবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। জয়ললিতার সঙ্গে এম.জি.আর. -এর সঙ্গে একটি গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল ও তাঁর বিপরীতে অভিনয় করে জয়ললিতা চলচ্চিত্র দুনিয়ায় নাম করেছিলেন। পরে জয়ললিতা ছ'বার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন। জয়ললিতার মুখ্যমন্ত্রীত্বের প্রথম পর্বে (১৯৯১-৯৬) তামিলনাড়ুর নাগরিক পরিসর জয়ললিতার বিভিন্ন কাল্পনিক ভঙ্গীর সুবিশাল কাটআউটে ভরে গিয়েছিল। আমি চেন্নাইয়ের যে অঞ্চলে বড় হয়েছি, তা ছিল তাঁর বাসভবনের এক কিলোমিটার ও তাঁর দল অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুনেত্র কাজগম (এআইএডিএমকে)-এর প্রধান কার্যালয় থেকে ৩০০ মিটার দূরে। হিন্দু দেবী দূর্গার মত সিংহের পিঠে বসা মুখ্যমন্ত্রী, তাঁকে ঘিরে আছেন তাঁর সমর্থকরা বা শিশু কোলে মাতৃরূপে মুখ্যমন্ত্রী, এমন অসংখ্য কাটআউট আমি দেখেছি। এই সময়ই তামিল অভিনেত্রী খুসবু সুন্দরের অনুরাগীরা তাঁর মূর্তিসহ একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সারা দেশ এর বিরদ্ধে তীব্র সমালোচনায় ফেটে পড়ে ও এই ঘটনা তামিলনাড়ুর জনগণের চলচ্চিত্র তারকাদের নিয়ে অপরিমিত পাগলামি করার প্রবণতা আরও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। খুসবু প্রথমে এআইএডিএমকে-র প্রতিদ্বন্দ্বী দল দ্রাবিড় মুনেত্র কাজগমে (ডিএমকে) যোগ দেন এবং তারপরে দেশের অন্যান্য মুখ্য রাজনৈতিক দল, যেমন কংগ্রেসে ও সম্প্রতি বিজেপি-তে যোগ দেন। তাঁর এই সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মজীবন থেকে আরও স্পষ্ট হয় যে, তামিল ভোটদাতারা চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের উদ্দেশ্যে ঘোষিত চাটুবাক্যের দ্বারা খুব সহজে প্রভাবিত হন। আজ এ কথা সর্বজনবিদিত যে, চলচ্চিত্রই তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে প্রবেশের সহজতম পন্থা। তাই আমরা অনায়াসে ধরে নিতে পারি যে, তামিল ভোটদাতারা রাজনীতির বিষয়ে নিতান্তই অজ্ঞ ও তাঁদের মতামতকে সুকৌশলে বদলে ফেলা যায়।

তবে, এম.জি.আর. যুগের ঠিক পরের সময়ের তামিল চলচ্চিত্রের তর্কাতীতভাবে দুই বৃহত্তম তারকা কমল হাসান ও রজনীকান্তের বিফল রাজনৈতিক কর্মজীবনকে বিবেচনা করে দেখা যাক। ১৯৬০-এর দশকে শিশু অভিনেতা হিসেবে ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবেশ করার পর হাসান নানা শৈলী ও ভাষা মিলিয়ে ২০০টির বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন, যদিও এর মধ্যে অধিকাংশই তামিলভাষী চলচ্চিত্র। তাঁর অভিনীত ছবিগুলি ক্রিটিকস-অ্যাওয়ার্ড জিতেছে শধু নয়, বক্স অফিসে সাফল্যও পেয়েছে। ২০১৮ সালে তিনি মাক্কাল নিধি মায়াম নামে একটি রাজনৈতিক দল শুরু করেন। কিন্তু, মহাতারকার মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও, তাঁর দল ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন ও ২০২১ সালের তামিলনাড়ুর বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিটি আসনেই হেরে যায়। এই হারের তালিকায় ছিলেন স্বয়ং কমল হাসান। তিনি তাঁর দক্ষিণ কয়েম্বাটোর নির্বাচনীক্ষেত্রে বিজেপির মত একটি দল, তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে যার প্রভাব ও উপস্থিতি বরাবরই যৎসামান্য, তার

কাছে হার স্বীকার করেন। ২০২৪ সালে এমএনএম ক্ষমতাশালী ডিএমকে দলের সঙ্গে জোট বেঁধে বিজেপির বিরুদ্ধ ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং এই জোট অতি সহজেই বিশাল সংখ্যায় জয়লাভ করে।

এদিকে, রজনীকান্ত, তারকা হিসেবে যাঁর প্রভাব ও ক্ষমতা সম্ভবত হাসানের চেয়ে অনেক বেশি হলেও, রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন। গত কয়েক দশক ধরে রজনীকান্তও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিফলতার মুখ দেখেছেন। "মহানায়ক" হিসেবে পরিচিত রজনীকান্ত, যাঁর অনুরাগীর সংখ্যা তামিলনাড়ু বাইরেও বহুদূরে ছড়িয়ে পড়েছে (বিশেষ করে জাপানে), ১৯৯০-এর দশকে তামিলনাড়ুর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তথা তাঁর প্রতিবেশীর বারংবার বিবাদে জড়িয়ে পড়ে খবরের শিরোনামে আসেন। কার্যত, তারকার দিক থেকে জয়ললিতার বিষয়ে খোলাখুলি নিন্দাবাদ হয়ত ১৯৯৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ডিএমকে-র ক্ষমতায় ফিরে আসার ক্ষেত্রে অনেকটা সাহায্য করেছিল। তার পরের দুই দশক ধরে, রজনীকান্ত মাঝে মাঝেই তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক সমুদ্রের জল পরখ করলেও কখনই পুরোপুরি ডুব দেন নি। অবশেষে ২০১৮ সালে যখন তিনি রজনী মক্কল মন্দ্রম নামের রাজনৈতিক দলটি তৈরি করে কোমর বেঁধে রাজনীতিতে নামোইরিতখনতাঁর এই পরীক্ষা আশ্চর্যজনকভাবে ক্ষণজীবী বলে প্রমাণিত হয়। এই দল কোনও নির্বাচনে অংশ নেয় নি এবং ২০২১ সালে তা পুরোপুরি উঠে যায়। তারকা হিসেবে হাসান এবং রজনীকান্তের প্রতি তাঁদের ভক্তদের প্রবল শ্রদ্ধা ও আনুগত্য, এই দুই তারকার দলের রাজনৈতিক মতাদর্শের কোনও রকম স্পষ্টতা এবং পেশাগত রাজনৈতিকদের সমান অভিজ্ঞতার অভাবকে অতিক্রম করতে পারে নি।

রজনীকান্ত ও হাসান কেন রাজনীতিতে সফল হতে পারেন নি, তার ব্যাখ্যা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং, তার বদলে আমি তামিল রাজনীতির জটিলতার দিকটির উপর জোর দিতে চাই। অবশ্যই, তামিল চলচ্চিত্রশিল্প ও রাজনীতির মধ্যে বহুদিন ধরেই গভীর সম্পর্ক আছে (এই বিষয়টি নিয়ে থিয়োডর বাস্কারন, রবার্ট হার্ডগ্রেভ জুনিয়র, কে. শিবথাম্বি, এম.এস.এস. পাণ্ডিয়ান, সারা ডিকি, সেলভারাজ ভেলিয়ুথাম, প্রেমিন্দা জ্যাকব এবং আরও অনেকে কাজ করেছেন), কিন্তু, সেই যোগাযোগকে শুধুমাত্র চলচ্চিত্রে একজন ব্যক্তি অভিনেতার সাফল্য বা তথাকথিত সাধারণ ভক্তের চাটুবাক্য দিয়ে ব্যাখ্যা করে লঘু করে দেখলে তামিল ভোটদাতাদের রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞান *এবং* তামিলনাড়ুর ক্ষমতাশালী দলগুলির রাজনৈতিক সূক্ষ্মবুদ্ধিকেই তুচ্ছ করা হয়। বাস্তবে, তামিলনাড়ুর নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ভোটদাতারা চলচ্চিত্র-তারকাদের সমর্থন করার সময় যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন এবং আদতে তাঁরা রজনীকান্ত ও হাসানকে প্রত্যাখ্যান করেছেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে, অভিনেতা হিসেবে নয়।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিজয়কান্ত, শরৎকুমার, এবং রাধিকা শরৎকুমারের মত সমসাময়িক কয়েকজন সমসাময়িক অভিনেতা নির্বাচনে জিতে ও নিজেদের দল তৈরি করে রাজনীতির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে মোটামুটি রকমের সাফল্য পেয়েছেন, কিন্তু এমনকি, তাঁদের এই সাফল্যকে এম.জি.এম. -এর মত ব্যক্তিত্বের তুলনায় সামান্যই বলা যায়। বিজয়কান্তের দল বিধানসভায় হাতে গোনা কয়েকটি আসন জিতেছেন আর ওদিকে, শরৎকুমারের দল খুব সম্প্রতি বিজেপি-র সঙ্গে জোট বেঁধেছে। খুসবু বিভিন্ন দলে যোগ দিলেও কোনও নির্বাচনে জেতেন নি। বিজয় সদ্য এই লড়াইতে প্রবেশ করেছেন ও অজিতকুমার, সুর্য, জ্যোতিকা, কার্তি, নয়নতারা, তৃষা কৃষ্ণান ও ধনুশের মত অভিনেতারা রাজনীতি থেকে নিজেদের দূরেই রেখেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন, যার থেকে তারকাদের প্রভাব ও জনগণের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে যে একটি সুবিশাল বদল এসেছে তা বোঝা যায়। তামিলনাড়ুর রাজনীতির অন্দরে প্রবেশের সহজতম পথটি চলচ্চিত্রশিল্পের আঙিনা দিয়ে গেছে – এই দীর্ঘস্থায়ী কটাক্ষটি, মনে হয়, এম. করুণানিধি, এম.জি.আর. ও জয়ললিতার মত গত প্রজন্মের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের প্রতি অনেক বেশি প্রযোজ্য। এঁদের মধ্যে দুইজনের একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সক্রিয় সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনই সম্ভবত এই কটাক্ষকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু এই দুইজনের সাফল্যকে তাঁদের যেমন চলচ্চিত্র-জীবনের প্রেক্ষিতে বিচার করে তাকে লঘু করা যায় না, তেমনই সেই জীবন থেকে তাকে বিচ্ছিন্নও করা যায় না।

উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রথমদিককার এই নেতাদের কর্মজীবনের গতিপথকে ই.ভি. রামস্বামী পেরিয়ারের আত্মসম্মান বা সেলফ-রেসপেক্ট আন্দোলন দ্বারা চিহ্নিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, এই আন্দোলন হিন্দুত্বের জাতি ও লিঙ্গ পরিচয়কেন্দ্রিক অনুক্রমকে প্রশ্ন করেছিল ও হিন্দিভাষী উত্তর ভারত থেকে আলাদা হয়ে তামিল (বা দ্রাবিড়) নাড়ুর নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ভারত একটি গণতন্ত্র রূপে ঘোষিত হওয়ার পর, সি.এন. আন্নাদুরাই, আত্মসম্মান আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় সদস্যদের মধ্যে একজন, ডিএমকে-কে নির্বাচনে অংশগ্রহণে সক্ষম একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৭০-এর দশকের শুরুর দিকে এম.জি.আর.-এর নেতৃত্বে বেশ কিছু সদস্য ডিএমকে থেকে বেরিয়ে এসে এআইএডিএমকে প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরে তামিল নাড়ুর অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল হয়ে ওঠে। এক কথায় বলতে গেলে, তামিল রাজনীতির দুই প্রধান চালকের রাজনৈতিক মতাদর্শ ও কার্যপদ্ধতির উৎস সুতরাং এক ও অভিন্ন। এঁদের দুজনেরই প্রজ্ঞাপনের কৌশল ছিল চলচ্চিত্রের উপর নির্ভরশীল। চলচ্চিত্রশিল্প ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে শুধু দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভই করে না, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চল এবং অক্ষরজ্ঞানহীন দর্শকের কাছেও সহজে পৌঁছে যেতে শুরু করে। চলচ্চিত্রের এই বৈশিষ্টটি নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনীতির জন্য উপযোগী ছিল। এই সময়ই ডিএমকে-র মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে চলচ্চিত্রের ব্যবহার, দলীয় চিহ্নকে (লাল ও কালো পটভূমিতে উদীয়মান সূর্য) অন্তর্ভুক্ত করে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং জাতি/শ্রেণীকেন্দ্রিক অনুক্রমের সমালোচনামূলক চিত্র ছড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়। এছাড়াও এম.জি.আর., শিবাজি গণেশন, জয়ললিতার মত ব্যক্তি-তারকার উদ্দেশ্যে ফ্যানক্লাব তৈরি করে দলের ক্যাডারদের উৎসাহিত ও সক্রিয় করে রাখা হত। এই ক্লাবগুলির সদস্যরা স্থানীয়ভাবে পরিচালিত অনুষ্ঠানে তাঁদের দলের জন্য প্রচার করতেন ও অনেক সময় নিজেরাই রাজনীতিতে প্রবেশ করতেন।

যাঁরা চলচ্চিত্র ও রাজনীতি দুই ক্ষেত্রেই কাজ করেছেন, তাঁদের কর্মজীবনও আমাদের বিবেচনা করা উচিত। যেমন, এম. করুণানিধি চলচ্চিত্রের জগতে থাকাকালীন, ১৯৫২ সালে *পরাশক্তি* নামের একটি নজিরহীন ছবির জন্য সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর জিনিসগুলিকে ব্যঙ্গ করে একটি অগ্নিগর্ভ চিত্রনাট্য লেখেন। এই সময়ই, ত্রিচি-র এমএলএ হিসেবে তিনি ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকদের অধিকারের দাবীতে বিক্ষোভ শুরু করেন। একটি ক্ষেত্রে তাঁর এই ধরনের কাজকে অন্য ক্ষেত্রের কাজ থেকে পৃথক করা যায় না, কারণ দুই-ই একই রাজনৈতিক মতাদর্শকে সমর্থন করা যা আবার ডিএমকে-তে তাঁর অবস্থান থেকে উঠে এসেছিল। এই সময় রাজনীতিতে চলচ্চিত্র-ব্যক্তিত্বদের সাফল্য সম্ভব হয়েছিল চলচ্চিত্রশিল্প ও ডিএমকে দলের গভীর প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধনের কারণে, কেবলমাত্র আপাতদৃষ্টিতে অজ্ঞ ও তোষামুদে ভোটদাতাদের সাহায্যে নয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ১৯৬০-এর দশক নাগাদ, এম.জি.আর.-এর ছবিগুলিতে ডিএমকে-র মতাদর্শের প্রচারে কিছুটা শিথিলতা দেখা দেয়, এবং কোনও একটি বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি ছবিগুলি ব্যক্তিকেন্দ্রিকও হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও, তাঁর চলচ্চিত্রগুলি তখনও ডিএমকে-র মতাদর্শ ও প্রতীকের সঙ্গে মোটামুটি দৃঢ়ভাবেই সংযুক্ত ছিল। চলচ্চিত্রে অভিনয়ের বাইরেও এম.জি.আর. সক্রিয়ভাবে দানমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হওয়ার মত রাজনৈতিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আদি প্রজন্মের এই রাজনীতিবিদরা, যাঁরা ধারাক্রমে চলচ্চিত্রকে প্রজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহার করেছেন, তাঁদের পর এমন একজনও নেই যিনি চলচ্চিত্র ও রাজনীতি – এই দুই ক্ষেত্রেই সাঙ্ঘাতিক সফল হয়েছেন।

অবশেষে, চলচ্চিত্র ও রাজনীতির মধ্যে এই গভীর সম্পর্ক শুধুমাত্র তামিলনাড়ু ও তার প্রতিবেশী রাজ্যের ক্ষেত্রেই অনন্য নয় (প্রবীণ ও অভিজ্ঞ অভিনেতা এন. টি. রামারাও তেলুগু দেশম পার্টি শুরু করেন, এবং ১৯৮০ ও ৯০-এর দশকে তিনি তামিলনাড়ুর প্রতিবেশী রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনবার নির্বাচিত হয়েছিলেন। সমস্ত "দক্ষিণ ভারত"-ই তারকাদের প্রতি বিশেষভাবে দুর্বল – এই জনপ্রিয় আখ্যানটিতে তাঁর এই সাফল্য আরও একটি নতুন গল্প যোগ করে।) ভারতের অন্যান্য অংশেও চলচ্চিত্র থেকে রাজনীতির প্রাঙ্গণে উপনীত হওয়ার তালিকা সুদীর্ঘ ও দলগত পরিচয় এক্ষেত্রে কোনও সমস্যা নয়।

সুনীল দত্ত, ধর্মেন্দ্র, জয়া বচ্চন, উর্মিলা মাতোন্ডকার এবং কঙ্গনা রানাউতের মত কয়েকটি নাম থেকে বোঝা যায় যে তারকাদের প্রভাব বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরেও সমানভাবে সক্রিয়।

আরও ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, চলচ্চিত্রের পৃথিবী ও রাজনীতির দুনিয়া যে যে বিন্দুতে মেলে, সেগুলিকে কোনও একটি অঞ্চলের নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট (বা অনগ্রসরতা) দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। বরং আধুনিক পৃথিবীর গণমাধ্যম, সমাজ ও রাজনীতির মধ্যে ধারণাগত বন্ধনের মাধ্যমেই এই ব্যাখ্যা সম্ভব। এই বন্ধনের অস্তিত্ব বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে শুরু করে, আজও সমানভাবে দৃশ্যমান এবং তা দেখা যায় সব পরিসরে – গ্লোবাল সাউথ ও নর্থে, একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্রে সমানভাবে। তাই, একটি সমীক্ষা বলে যে, ফ্রান্সের থেকে স্বাধীনতা আদায়ের জন্য ১৯৫০-এর দশকে আলজেরিয়া লড়াই এবং আজ সেই লড়াইকে কিভাবে মনে রাখা হয়েছে, তার পিছনে আলজেরিয়ার চলচ্চিত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আরেকটি সমীক্ষা দেখিয়েছে যে, আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রক্ষণশীল ও উদারপন্থী রাজনীতির প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিসর হিসেবে চলচ্চিত্রকে যথেষ্ট কাজে লাগান হয়। চলচ্চিত্র যেমন জার্মানি ও ইটালির ফ্যাসিবাদী শক্তিকে সাহায্য করেছিল, তেমনই কোরিয়া আর প্যারাগুয়ের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেও তা সমান সহায়তা দিয়েছিল। চলচ্চিত্র ও রাজনীতির সম্পর্ক জটিল আর তাকে কখনই শুধুমাত্র তারকমুগ্ধতা বা অদ্ভুত একটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টতে পর্যবসিত করে ছোট করা যায় না। ভারতের ভোটদাতারা বারংবার প্রমাণ করেছেন যে যদি তাঁদের বুদ্ধিমত্তাকে হেয় করা তাত্ত্বিক ও পণ্ডিতদের দিক থেকে একটি সুবিশাল ভুল পদক্ষেপ। এর সবচেয়ে সাম্প্রতিক উদাহরণ, ২০২৪ সালে ভারতের জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় ফিরে এলেও, দেখা গেছে যে, ভোটের ফলাফল নিয়ে যাবতীয় ভবিষ্যদ্বাণীকে ভুল প্রমাণিত করে, এই দলের শক্তি ও প্রভাব অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। গত দুই দশকে যে তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে একটি তুমুল পরিবর্তন এসেছে এবং তামিল চলচ্চিত্র ও তামিল রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে যে সরাসরি বন্ধন ভারতের স্বাধীনতালাভের পরবর্তী যুগকে চিহ্নিত করেছিল, তা যে আর ততটাও দৃঢ় নেই এবং রাজনীতির দাবাখেলায় যে তামিল ভোটদাতারা নগণ্য বোড়ে মাত্র নন, তা স্বীকার করার সময় এসেছে।

রাধা কুমার সিরাকুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।